বাংলা-দেশভাগ

স্মৃতি সংস্কৃতি

আর্থ-রাজনীতি

সম্পাদনা

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

Where should the birds fly after the last sky ?

সূচিপত্র

ভূমধ্যসাগরের এপারের বাতাস কী এখন মেটালিক !		৯

অঙ্গীকার...

মিলনপারাবারে নিয়তির অভিসার	জওহরলাল নেহরু (অনুবাদ: মানস মুখোপাধ্যায়)	১৩
ন্যায়-বিচার এবং অপক্ষপাতমূলক নীতির দ্বারা আমি সর্বদা পরিচালিত হব ...	মহম্মদ আলি জিন্না (অনুবাদ: অভিক্ষেপ)	১৬

পুনর্পাঠ...

বাংলাদেশে : পুনরায়	অন্নদাশঙ্কর রায়	২১
বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান	ভবানী সেন	৩৬
পরাজয়টা তাহলে কার কাছে	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৫২

স্মৃতি...

দেশভাগ ও মানবীয় সম্পর্ক	দিলীপ দাস	৭৫
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে	অমর মিত্র	৮৫
ভাঙা দেশ, স্মৃতির ফ্ল্যাটবাড়ি	সাধন চট্টোপাধ্যায়	৯২
যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের...	তীর্থঙ্কর চন্দ	১০৮
কাঁটাতারের এপার ওপার	সুশীল সাহা	১১৪
দেশভাগ: কিছু স্মৃতি, কিছু কথা	সুকুমার সেন	১২৪
সুনীতিবালাদের ফেলে আসা দেশ	সঞ্জীব দাস	১২৮
দেশভাগে কার সুখ !	আয়েশা খাতুন	১৩৬
ধুবুলিয়া: স্মৃতিকাতর উদ্‌বাস্তু জীবন	অলকেশ দাস	১৪৮

সংস্কৃতি...

দেশভাগ আমার সচেতন মননে ও অবচেতন আবেগে দুভাবেই কাজ করেছে ...	তানভীর মোকাম্মেল	১৫৭
দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস: প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	১৬৭
পূর্ববাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব	পিংকি সাহা	১৭৫
ছিটমহলের বৃত্তান্ত: ইতিহাসে ও আখ্যানে	লতিফ হোসেন	১৮৬
‘দরদি কে দিল ভাঙ্গিয়া ...’	শুভাশিস ভট্টাচার্য	২০৯
বাংলা কবিতায় দেশভাগ: বধ্যভূমির আখ্যান	পার্থসারথি হাটি	২২০

‘মুখপানে, কেন চেয়ে আছ গো মা ...’	সুশান্ত পাল	২৩৪
উত্তরবঙ্গের দেশভাগ, দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতি ও আখ্যান	প্রদীপ রায়	২৪২

আর্থ-রাজনীতি...

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাষ্ট্র	বদরুদ্দীন উমর	২৪৯
দ্বিখণ্ডিত ভারত	গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা	২৫৬
দেশভাগের অর্থনীতি	কুমারজিৎ মণ্ডল	২৭৩
দেশভাগের রাজনীতি	অভ্র ঘোষ	২৭৭
‘র‍্যাডক্লিফ রেখা’-য় দুই বাংলার প্রশাসনিক স্থিতি: সীমানা বদলের কথা	দেবনারায়ণ মোদক	২৮৪
উনিশশো সাতচল্লিশ	ওয়াসি আহমেদ	২৯৯
দেশভাগ: হৃদয়ের ধ্বংসাবশেষ	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১১
ভারত আমার ভারতবর্ষ— গায়ে তোর কাপড় কোথায়?	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	৩১৬
শিকড় ছেঁড়া প্রাণ— ফিরে দেখা	রাহুল রায়	৩২৯
ভাগের স্বাধীনতা: ছিন্নমূলের উত্তরকাল	কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর	৩৪০
৪৭ পরবর্তী অবিভক্ত দিনাজপুর ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা	সমিত ঘোষ	৩৫০
দেশান্তরের রাজনীতি: দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি	অলককুমার ঘোষ	৩৭৫
নদিয়া জেলায় উদ্‌বাস্তু আন্দোলন	সুভাষ বিশ্বাস	৩৮৬
বাঁকুড়ার উদ্‌বাস্তু ভূমি	সুখেন্দু হীরা	৩৯৭
মেমারি ব্লকের উদ্‌বাস্তু জীবনের ইতিবৃত্ত	কাজী নূরুল হামিম	৪০৭
দলিত রাজনীতি ও দেশভাগ— একটি ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি: দেশভাগের প্রেক্ষাপটে দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্তিকরণ রাজনীতির একটি বিশ্লেষণ	বিশ্বজিৎ পাল	৪১৬
বিহারি জনজীবনে দেশভাগ ও রাষ্ট্রহীনতা	মিজানুর রহমান নাসিম	৪২৬
বাংলাভাগের দায় ও বাস্তুহারাদের দায়িত্ব	দেবাশিস মল্লিক	৪৪১
দেশভাগ ও ইসলামোফোবিয়া: মানবাধিকার লঙ্ঘনের আন্তর্জাতিক অভিঘাত	সাহাবুদ্দিন	৪৪৮

বয়ান...

মরিচঝাঁপির ঘটনা প্রসঙ্গে জ্যোতি বসুর বক্তব্য		৪৬৯
আলোকচিত্র		৬৭-৭৪ এবং ৩৬৭-৩৭৪
লেখক পরিচিতি		৪৮২

ভূমধ্যসাগরের এপারের বাতাস কি এখন মেটালিক!

বছর চোদ্দোর প্রাণোচ্ছল, স্বপ্নমুখর, বাপ-মায়ের আদুরি কিশোরী ফারহা। প্যালেস্তাইনের এক গ্রামীণ জনপদ তার বাসভূমি। সেখানে নেমে আসা ঝরনার জলে সূর্যালোক ঝিকমিক করে, বাতাস দুলিয়ে দেয় ফারহা-ফরিদার দোলনা। স্পন্দিত বুকে আগামী স্বপ্ন; একদিন শহরে পৌঁছে যাবে তারা, ধর্মীয় প্রথানিয়ন্ত্রিত শিক্ষার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে জ্ঞান যেখানে অবারিত। ক্ষুদ্র মানুষের ছোটোখাটো ইচ্ছেপূরণের পরোয়া কবে করেছে পৃথিবীর অধীশ্বরেরা। নেমে আসে 'নাকবা'; নারকীয় বিপর্যয়! এক জাতের মানুষের বাসভূমি সংকুলানে অপর ধর্মের মানুষকে উৎখাত করো যেমন করে পারো। শুরু হয় গণপ্রস্থান। নিজের স্বদেশেই বাস্তুচ্যুতির অভিযান। কৈশোরক সময়কাল হয়ে উঠল গণহত্যায় সন্ত্রস্ত ভীত, বীভৎসায় শিহরিত। শকুনের খরতর দৃষ্টিপাত আর বিচ্ছুরিত বারুদবাতাসে পলায়নপর ঊর্ধ্বশ্বাস, স্বজন হারানোর নৈঃশব্দ্য; আর্তনাদ দীর্ঘশ্বাস হাহাকারে ফারহা নারীত্ব অর্জন করল। ইজরায়েল নামের নতুন দেশ পত্তনে ভূখণ্ড দখলের হানাহানি শুষে নিল কিশোরী মনের যাবতীয় চঞ্চল্য, সারল্য মুখরতা। বাইরের দখলদারির রক্তপাত ফারহাকে ইতিহাসের রক্তাক্ত সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিল; আচম্বিতেই ফারহা হয়ে উঠল রজঃস্বলা নারী। ঋতুস্রাবের রোহিতধারার সঙ্গে তার স্বদেশবাসীর অকারণ শোণিতপ্রপাত একাকার হয়ে সূর্য গেল পাটে; নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ছায় জন্মভূমি।

ঋতুস্নান সেরে নিশ্চুপ নিথর বাক্‌হীন ফারহা সীমানার পর সীমানা পেরিয়ে চলে: তার দেশ প্যালেস্তাইন গেছে চুরি! কোন সীমানার শেষে সে ফিরে পাবে তার বাসভূমি!

এক যে ছিল টোবা টেক সিং। তাকে কেন্দ্র করে সহজ প্রশ্ন উঠতে পারে— কোন্ সারণিভুক্ত সে ? অপ্রকৃতিস্থ তারও এক স্বদেশ আছে। আঁতিপাঁতি করে সে খুঁজে চলেছে তার গ্রাম— টোবা টেক সিং। বিষণ সিং তার নাম। দীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরে পাগলাগারদে বন্দি; একদিনের জন্যেও তার চোখে ঘুম নামেনি, সব সময় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার পা-দুটো গেছে ফুলে। ভারতদেশ ভাগের পর যখন দু-দেশের মাতব্বরেরা ঠিক করলেন বন্দি বিনিময়ের মতো দু-দেশের পাগলদেরও আদান-প্রদান করা হবে, তখন টোবার উন্মাদনার মাত্রা গেল বহুগুণ চড়ে। কেননা, এক্ষেত্রে স্থির হয়েছে হিন্দু-শিখ পাগলদের পাঠানো হবে হিন্দুস্তানে আর মুসলিম উন্মাদদের পাকিস্তানে। স্মৃতিভ্রংশ বিষণ সিং জনেজনে জিজ্ঞাসা করে তার শৈশব বিজড়িত টোবা টেক সিং কোথায়? বন্দি অপর পাগলের তা জানার কথা নয়। কিন্তু, সিপাহি-সান্ত্রি, এককালের বন্ধু ফজলদিন-ও তাকে সঠিক তথ্য জানিয়ে দিতে পারে না— তার গ্রাম এখন পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। কেননা, বিষণকে পাঠানো হচ্ছে হিন্দুস্তানে। অপরাপর পাগলদের মতো সে-ও এই স্থানান্তরের প্রবল বিরোধী। কেউ বুঝতেই পারছিল না যে, এক জায়গা থেকে তাদের অন্য কোন্ জায়গায় ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। সবাইকে জোর করে সীমানার এদিকে ওদিকে পাঠানো গেলেও টোবা টেক সিং হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের মাঝামাঝি জায়গায় তার ফোলা-পা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো শক্তিই তাকে যেন সরাতে পারবে না। সূর্যোদয়ের পূর্বে শোনা গেল ভীষণ আর্তনাদ। দেখা গেল দীর্ঘ পনেরো বছর পর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিষণ সিং ওরফে টোবা টেক সিং। তার পায়ের কাছে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুস্তানের পাগলরা এবং মাথার কাছে মুসলমান পাগলদল।

দুই সীমান্ত মধ্যবর্তী একফালি জমি কি সেই কাঙ্ক্ষিত টোবা টেক সিং, যা অনধিগম্য? কানে ভাসছে— ‘ওপড় দি গড়গড় অ্যানেক্স দি বে-ধিয়ানা দি মুঙ্গ দি দাল অফ পাকিস্তান অ্যান্ড হিন্দুস্তান অফ দি দূর ফিটে মুহ!’... অসংলগ্ন কিন্তু অমোঘ উচ্চারণে টোবা টেক সিং কি সীমান্তভাগের ‘Sanity’-কে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ফিরিয়ে দিতে বলে ছিনিয়ে নেওয়া স্বদেশভূমি?

দেশহারা মানুষ, তাদের অনপনেয় যন্ত্রণা, নিরাশ্রয় অস্তিত্বের শূন্যতা বোধ, আমৃত্যু জর্জরিত অনিস্তার সত্তাসংকটের জট সংলগ্ন হয়ে আছে স্মৃতিকাতর মৌখিক ইতিপর্বে; যাপনে রচিত, বাধ্যত আত্তীকৃত তথা অন্যোন্য সংস্কৃতির পর্যাসে,

ওতপ্রোত অবশ্যই আর্থ-রাজনীতির কূটবাধ্যতা, অন্ধিসন্ধি। অভিক্ষেপ পত্রিকার দেশভাগ সংখ্যা প্রকাশের তাগিদের মূলে আছে পুনর্পাঠে বিপর্যাসের বিনষ্টির সময়কালকে সদাসর্বদা জাগ্রত রাখা, জনস্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে না দিয়ে ক্রমাগত পর্যালোচনায় অনুত্তর বয়ানকে প্রকাশ্য সংলাপে উত্থাপিত করার দায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে কতশত দেশভাগের আখ্যান, প্রবন্ধাবলি, মায় আর্কাইভ তো সহজলভ্য, হাতের নাগালে। আবার কেন সংখ্যাভারের গতানুগতিক উগর-চর্বণ!

আমাদের কৈফিয়ত— মশাই দেশ চুরি হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত পায়ের তলার মাটি ধসে যাচ্ছে; ক্ষণভঙ্গুর আমাদের অবস্থান। এক দেশের মাঝেই দুই-দেশ কাঙাল আর বিলিয়নেয়ারের; জাতপাত ধর্ম লিঙ্গের প্রকোষ্ঠাবদ্ধ বহু দেশ! ভৌগোলিক সীমানার কাঁটাতার ভাগাভাগির প্রাচীর ধূলিসাৎ করে এক দেহে এক প্রাণে এক তানে বাঁধল কই! ক্ষুধা নয় ক্ষুধার্তকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর আয়োজন কেন দৃঢ়তর হয়? প্রশ্ন তুলবেন না মশাই,— সবপেয়েছির না হলেও ন্যূনতম মানুষিক অধিকারে পাশাপাশি বেঁচে থাকার দেশ কই? অথচ, দেশভাগের সময় প্রতিশ্রুতি তো ছিল, বাগাড়ম্বরে ঘোষণা— আসন্ন আজাদি ছিনিয়ে আনবে রাঙাপ্রভাত। সুতরাং, আপাতত মেনে নাও খুন ধর্ষণ লুঠপাট বাস্তুহীনতার কোল্যাটারাল ড্যামেজ; দেশভাগ থেকে দেশগঠনের প্রক্রিয়ায় এটুকু বস্তুগত মূল্য না-চোকালেই নয়! কিন্তু? তবু...। প্রচ্ছন্ন স্বদেশ যে ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়, অনাহার দ্বেষ উৎকট লালচ পরিণামী সত্য মনে হয়। হারিয়ে গেল যাঁদের ‘দিঘিকালোজল’, ‘সিঁদুরে মেঘের আমচারা’, বট অশ্বত্থ পাকুড়, আইতে শাল যাইতে শাল, ফকিরি আস্তানা, উজান গাঙে মনমাঝির উদাসী সুর, লীলাবালি কইন্যার গোধূলিরঙিন ব্রীড়া অথবা বম্বে টকিজের ‘হিপতুল্লা’ বন্ধন; কুরে কুরে কি খাবে না তাদের প্রতিপ্রশ্ন— কী প্রয়োজন ছিল ভারত ভেঙে ভাগ করার! বাফারের এপারে দাঁড়িয়ে ভৃগু আর্তনাদ করবেই— দোহাই আলি! দোহাই আলি! দেশভাগের ট্রমা ও তার ক্রমাগত প্রতিস্মরণ তাই জরুরি দৃশ্যমান অথবা অদৃষ্ট বর্ডারলাইন, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিকে প্রশ্নক্ষুব্ধ করতে। দেশভাগ সংখ্যা প্রকাশের তাগিদে কার্যকর এই কৈফিয়ত।

রক্তনদীর কল্লোল থেকে উঠে আসে ইয়াসিন হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ গগন বিপিন শশী; চেয়ে দেখে পাথুরেঘাটা মানিকতলা শ্যামবাজার গ্যালিফ স্ট্রিট এন্টালির পথেঘাটে ছুরি শানাচ্ছে তারা পরস্পর! গাজা স্ট্রিপের আল-শিফা হাসপাতালে স্তূপীকৃত হচ্ছে শিশুশব— আবিশ্ব চেয়ে দেখে; নিষ্করুণ ভোঁতা চোখ তাদের। দাফনবিহীন বাসি লাশে পচন ধরেছে ওই! পূতিগন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে প্রাণঘাতী সমরাস্ত্রের বারুদ বিস্ফারিত ঝাঁজালো আঘ্রাণ। ভূমধ্যসাগরের

মিলনপারাবারে নিয়তির অভিসার
জওহরলাল নেহরু

[স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্ত, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যরাত্রি, পার্লামেন্ট হাউসে প্রদেয় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর 'Tryst with Destiny' বক্তৃতার অনুবাদ।]

সুদীর্ঘ বছর ধরে নিয়তির সঙ্গে আমাদের অভিসার অব্যাহত ছিল। আজ আমাদের অঙ্গীকার সার্বিকভাবে অথবা পরিপূর্ণরূপে না হলেও উল্লেখযোগ্যভাবে সাধন করার মুহূর্ত সমাগত। মধ্যরাত্রির প্রহরে, বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জাগ্রত হবে তার স্বীয়সত্তা ও স্বাধীনতায়। ইতিহাসের এ-এক দুর্লভ মুহূর্ত, যখন আমরা পুরাতনী অন্ধকার ভেদ করে প্রবেশ করব নবদিগন্তে; যুগাবসানের এই আলোকপাতে বারংবার বিধ্বস্ত দমিত জাতির আত্মা আজ মূর্ত হয়ে উঠবে। উদ্‌যাপনের এই ব্রাহ্মক্ষণে, ভারত ও তার জনগণের সেবায়, বিশেষত বৃহত্তর মানবতার মহাযজ্ঞে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব। ইতিহাসের এই উষালগ্নেও ভারতের অন্তহীন অন্বেষা বহমান থাকবে, হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে লালিত থাকবে সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সাফল্য ও ব্যর্থতার স্মৃতি। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের গোলকধাঁধা তার দৃষ্টিকে অনুসন্ধানের অভিমুখ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি, বিস্মৃত করেনি তার আদর্শকে; এখানেই যে তার অফুরান শক্তির উৎস। দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতাকে পদদলিত করে ভারত আজ সত্যই নিজেকে পুনঃআবিষ্কার করবে। অর্জিত ধ্যানধারণা উদ্‌যাপনের শুভক্ষণ আজ। সূচনালগ্নের এই মুহূর্তে আমরা নিশ্চিত যে, বৃহত্তর সাফল্য ও কীর্তি আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। সাহস ও প্রজ্ঞায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এই আহ্বানে আমরা কি সাড়া দিতে পারব না?

স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দায়িত্বকে আবাহন করে। সেই দায়ভার এই গণপরিষদের ওপর ন্যস্ত। এই সার্বভৌম সংস্থাই প্রতিনিধিত্ব করবে স্বশাসিত ভারতীয় জনগণের। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বহু বেদনা ও যন্ত্রণাকে আমরা বহন করেছি, দুঃখদীর্ণ সেই স্মৃতিতে আমাদের হৃদয় ভারাতুর। কিয়ৎ যন্ত্রণার কাতরতা আজও অব্যাহত। তবুও বলব, অতীত আজ বিলীন হয়েছে, ভবিষ্যৎ আমাদের ডাক দিয়েছে।

সেই ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্য বা বিশ্রামের নয়, বরং নিরন্তর প্রচেষ্টার। আমরা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি তা যেন পূরণ করতে পারি, আজকে সেই প্রতিজ্ঞাকেই স্মরণ করব। ভারতের সেবা করা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ-কোটি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সেবা করা। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ক্ষুধা, ব্যাধি তথা সুযোগের অসমতার অবসান করা।

আমাদের প্রজন্মের মহতী প্রাণের স্বপ্ন ছিল, প্রতিটি মানুষের প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছে দেওয়ার। হয়তো তা এখন সম্ভবপর নয়, কিন্তু যতদিন মানুষের অশ্রু ঝরবে অথবা দুর্ভোগের পাকচক্রে বন্দি থাকবে তারা, ততদিন আমাদের কর্মোদ্যোগ স্তব্ধ হবে না।

অধরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আরও বেশি পরিশ্রম, আরও কাজ— অনেক বড়ো কাজে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। সেই অযুত স্বপ্ন শুধু ভারতের নয়, তা সমগ্র বিশ্বের। জগৎ জুড়ে সমগ্র জাতি আজ যে সৌভ্রাতৃত্বের একাত্ম নিবিড়তায় নিবিষ্ট রয়েছে, বিচ্ছিন্নতা সেখানে অভাবনীয়! বিশ্বজুড়ে শান্তি যেমন অবিভাজ্য, স্বাধীনতা-সমৃদ্ধি যেমন সর্বভোগ্য, তেমনি বিপর্যয় কোনো ভূভাগের খণ্ডিত ভবিতব্য হতে পারে না।

ভারতীয় জনগণের কাছে আমরা আবেদন করছি, এই দুঃসাহসিক অভিযানে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় সহায়ে আমাদের সহযোগী হতে। তুচ্ছ ধ্বংসাত্মক সমালোচনার সময় নয় এখন, নয় অন্যকে অভিসম্পাত ও দোষারোপ করার। স্বাধীন ভারতের জন্য এখন আমাদের উন্নত হর্ম্যপ্রাঙ্গণে সন্নিবেশিত হতে হবে, যা হয়ে উঠবে তার সমস্ত সন্তানের বাসযোগ্য।

নির্ধারিত দিন আসন্ন— নিয়তি নির্ধারিত দিন— দীর্ঘ তন্দ্রা ও সংগ্রামের পর ভারত পুনরায় দণ্ডায়মান— সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীনতার অভিব্যক্তির জন্য যা অপরিহার্য ছিল। অতীতের এই ঘোর এখনও কিয়দংশে আমাদের আবিষ্ট রেখেছে; তবু আমাদের বহু লালিত প্রতিজ্ঞাকে আজ রূপায়িত করতেই হবে। নতুন ইতিহাসের শুভারম্ভ হল আমাদের— যে ইতিহাসকে আমরা আমাদের সত্তায় লালন করতে সক্রিয় হব, এবং অন্যেরা তা লিপিবদ্ধ করবে।

সৌভাগ্যের এই মুহূর্ত কেবল ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়া এবং অবশ্যই সমগ্র বিশ্বের। নতুন তারার উদয় হল আজ; প্রাচ্যের স্বাধীনতার— এক নতুন আশার সঞ্চার, এক দীর্ঘলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল। এই জাজ্বল্যমান তারকা যেন অস্তমিত না হয়, বিশ্বাসভঙ্গে ও বঞ্চনায় যেন অবলুপ্ত না হয়ে যায় আমাদের আশা!

স্বাধীনতার আনন্দে আমরা উদ্‌বেলিত, যদিও মেঘের আস্তরণ আমাদের ঘিরে— বহু প্রাণ আজ দুঃখে জর্জরিত, গভীর সংকটে নিমজ্জিত। তবে স্বাধীনতা আমাদের সেই দায়িত্ব ও ভারবহনের ক্ষমতা দিয়েছে; আমরা মুক্ত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার মুখোমুখি হব।

এই দিনটিতে আমরা স্মরণ করতে চাই আমাদের স্বাধীনতার স্থপতিকে, জাতির পিতাকে, যিনি ভারতের প্রাচীন আদর্শকে প্রমূর্ত করে আমাদের পারিপার্শ্বিক অন্ধকারকে বিনাশ করতে স্বাধীনতার মশাল প্রজ্বলিত করেছিলেন। আমরা প্রায়শই তাঁর অযোগ্য অনুগামী হয়েছি, তাঁর বার্তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি; কিন্তু ভাবীকাল